একক৩৬ ❐ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে ইউরোপীয় বণিককুল

গঠন ঃ

৩৬.০ উদ্দেশ্য
৩৬.১ প্রস্তাবনা
৩৬.২ ইউরোপীয় বণিক : পর্তুগীজ
৩৬.৩ ইউরোপীয় বণিক : ওলন্দাজ
৩৬.৪ ইউরোপীয় বণিক : ইংরেজ
৩৬.৫ ইউরোপীয় বণিক : ফরাসী
৩৬.৬ ইউরোপীয় বণিককুল ও ভারতীয় অর্থনীতি
৩৬.৭ ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি ও তার প্রতিক্রিয়া
৩৬.৮ অনুশীলনী
৩৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপীয় বণিকরা কিভাবে ভারতের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল।
- ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি কিরূপ ছিল এবং তার প্রতিক্রিয়ার ধরন কিরকম ছিল।

৩৬.১ প্রস্তাবনা

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকট বন্দরে ভাস্কো-দা-গামার আগমন ভারতের বাণিজ্যিক জগতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে বহুদিন থেকেই ভারতীয় পণ্য ছিল বিশেষ সমাদৃত। এই পণ্যসম্ভার বিদেশের বাজারে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের যে ভূমিকা ছিল অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তর গবেষণায় তা আজ সকলেরই সুবিদিত। ভারতীয় বন্দরে ইউরোপীয় বণিকদের যাতায়াত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভাহতীয় বণিকদের এই ভূমিকা সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত ইউরোপীয় বাণিজ্য ভারত মহাসাগরে ভারতীয়দের হাতে যে বাণিজ্য ছিল তার অনেকটাই গ্রাস করেছিল।

৩৬.২ ইউরোপীয় বণিক : পর্তুগীজ

মালাবার উপকূলের বন্দর কালিকটে জাহাজ নিয়ে যখন পর্তুগীজরা আসেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। তাঁরা একদিকে যেমন চেয়েছিলেন এই নতুন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে তেমনই তাঁরা এদেশ থেকে বাণিজ্যের মাধ্যমে সুগন্ধি মশলা সংগ্রহ করতেও এসেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মপ্রধান পোপের কাছে সাম্রাজ্যের তালিকা পাঠাতে গিয়ে পর্তুগীজ রাজা ম্যানুয়েল ইথিওপিয়া, আরব ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের নাম যুক্ত করে বিশেষ গর্বিত হন। কালিকটের অধিপতি জামোরিনকে পর্তুগীজ নৌবহরের অধ্যক্ষ পেড্রো আলভারেজ ক্যাবরাল ১৫০০ সালে জানান যে, তাঁর প্রতি রাজার নির্দেশ হ'ল একজন একনিষ্ঠ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর স্বাভাবিক নৈতিক দায়িত্ব পালনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

এইভাবে ধর্মের জিগির তুলে প্রথম থেকেই পর্তুগীজরা ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত যাতায়াতকারী মুসলমান জাহাজগুলিকে আক্রমণ করে এই অঞ্চলের সমস্ত মশলার ব্যবসা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। ভারতীয়দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী জাহাজের সাহায্যে তারা একাজ করতে পারত। কিনতু জাহাজ ও নাবিকদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে ঘাঁটি স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। জামোরিনের কাছে সাহায্য না পেয়ে পর্তুগীজরা ১৫০২ সালে কালিকট বন্দরে হামলা চালায়। জামোরিনের প্রতিযোগী কোচিনের রাজা ১৫০৩ সালে তাদের নিজেদের এলাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন। কিন্তু পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয় ১৫১০ সালে বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া দ্বীপ দখল করার সময় থেকে। এই বিজয়ী পর্তুগীজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলফনসো ডি আলবুকার্ক। ইতিপূর্বে ১৫০৯ সালে ইজিপট্রে মামুলক সুলতান দিউ দখল করার জন্য যে নৌবাহিনী পাঠান, পর্তুগীজরা সেটি ধ্বংস করে দেয়। ১৫১১ সালে পর্তুগীজরা সুদূরপ্রাচ্যের সমুদ্রপথের প্রধান ঘাঁটি মালাক্কা দ্বীপুঞ্জ দখল করে। এরপর পারস্য খাঁড়িতে (Gulf) ওরমুজ বন্দর দখলের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পরিকল্পনা প্রায় সফল হয়ে ওঠে। এরপরে করমণ্ডুল উপকূলের সাও তোমে, বাংলার হুগলী ও চট্টগ্রাম, চীনদেশে পার্ল নদীর মুখে (estuary) ম্যাকাও এবং সিংহলের কলম্বো ইত্যাদি অনেকগুলি সুরক্ষিত বাণিজ্যিক উপনিবশে ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের দখলে আসে। ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ইতিহাসে এভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব স্থাপন এই প্রথম। এক সুদূর দেশ থেকে দম ম্যানুয়েল যেভাবে ভারতে তাঁর Estado da India বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করতে থাকেন এবং গোলমরিচ ও মশলা ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেন তাও ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অবশ্য শেষপর্যন্ত পর্তুগীজদের লোহিত সাগরের পথে ভূমধ্যসাগরে ভারতীয় মশলা ব্যবসার গতি সঞ্চালিত করার অভিলাষ অপূর্ণই থেকে যায়। বরং স্থলপথেই তুরস্কের ভূ মধ্যসাগরীয় বন্দরগুলিতে ভারতের হাল্কা অথচ দামী জিনিস পৌঁছত বেশি।

পর্তুগীজরা তাদের অধিকৃত বন্দরে চালু করে কার্তাজ (Cartaze) প্রথা। এই প্রথা অনুসারে এশীয় বণিকদের তাদের জাহাজের জন্য গোয়ার শাসকের কাছে অনুমতি ক্রয় করতে হ'ত। অন্যথায় তাদের

পণ্য বাজেয়াপ্ত হ'ত। এই নিয়ম মেনে নিয়েই বিজাপুরের সুলতান দাভল থেকে মোখা পর্যন্ত এবং পরে মক্কা ওরমুজ এবং লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের অন্যান্য বন্দরে জাহাজ পাঠাতে পারতেন। মুঘল সম্রাটকে পর্যন্ত সুরাট থেকে মোখা বন্দরে জাহাজ পাঠাবার জন্য ছাড়পত্র ক্রয় করতে হত। পর্তুগীজদের এই তদারকির ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গোয়াস্থিত পর্তুগীজ রাজকর্মচারী বা বণিকদের সহায়তা ভিন্ন অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাদের সঙ্গে মুনাফা বন্টনের চুক্তি না করলে ভারতীয় জাহাজগুলির পক্ষে পূর্ব আফ্রিকা, মশলা দ্বীপপুঞ্জ, চীন অথবা জাপানে যাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

পর্তুগীজরা যে শুধু অন্য বণিকদের পণ্য লুঠ করে বা তাদের মুনাফায় ভাগ বসিয়েই সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তা নয়। এশিয়া মহাদেশে গোয়ার নিজস্ব ব্যবসাও ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত। কিন্তু কর্মচারীদের অবিশ্বস্ততা এবং শাসনের শিথিলতার ফলে পর্তুগীজরা ভারতের সমুদ্রবাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাদের এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভূ মধ্যসাগরের মশলা ব্যবসা দখল করা বা লোহিত সাগর পথে এ ব্যবসার গতিরুদ্ধ করা কোনটাই তারা পারেনি। গোলমরিচের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাদের কোন একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদের প্রায়ই কম দামে গোলমরিচ বিক্রি করতে হ'ত এবং তুরস্কের অন্য ব্যবসায়ীদের সমান দাম নিতে হত। এবং এই দাম নির্ভর করত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পরিবহন এবং নিরাপদ ভ্রমণ ব্যয়ের উপর।

৩৬.৩ ইউরোপীয় বণিক : ওলন্দাজ

সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের একচেটিয়া মশলা ব্যবসার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল নেদারল্যান্ডসের ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। প্রথম থেকেই এই সংস্থা সুগন্ধি মশলা এবং গোলমরিচের ব্যবসা বলপূর্বক দখল এবং রক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়েছিল। কিন্তু এই কাজে ওলন্দাজদের প্রধান প্রতিযোগী ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকগণ ভারতীয় উপকূলের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। পর্তুগাল ও স্পেনের নৌশক্তি হ্রাস পাবার ফলে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৬০০ সালে মশলা এবং গোলমরিচের লাভজনক ব্যবসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৬০২ সালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওলন্দাজ বাণিজ্য সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহের কতকগুলি জটিল কারণ ছিল। প্রথমদিকে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের লক্ষ্য ছিল পর্তুগীজদের সবচেয়ে দুর্বল ঘাঁটি মশলা দ্বীপ এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। ওলন্দাজ নৌবহর অচিরেই আবিষ্কার করে যে, পর্তুগীজদের ভারী এবং শ্লথগতি জাহাজগুলি আক্রমণ করা তাদের পক্ষে আদৌ দুরূহ নয়। এর ফলে তারা অচিরেই সাবধনতা ত্যাগ করে এক আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে। পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের বাজারে অর্থের ব্যবহার প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের বিনিময়ে এই দ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করার অবাধ সুযোগ

ছিল। সেজন্যে পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের মরিচ ও মশলা ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের পূর্ব উপকূলের বস্ত্র ব্যবসায় অংশগ্রহণ ছিল অপরিহার্য।

করমণ্ডুল উপকূল এবং পশ্চিম ভারতে গুজরাতের সমতলভূমিতে নানাধরনের নকশার সূতীবস্ত্র বয়ন হ'ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপুঞ্জের বাজারে এই সকল বস্ত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ রকমের বাজার ছিল। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ তাঁতীগ্রামের সমৃদ্ধিই বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইসব বিদেশী বাজারের মধ্যে প্রধান ছিল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মশলা দ্বীপুগলি। এসব দ্বীপের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিনিময়ে রপ্তানি হ'ত ভারতীয় বস্ত্র। ভারতে মরিচ এবং মশলার চাহিদার দরুন এই ব্যবসা উভয় দিককার বণিককুলের পক্ষে বিশেষ লাভজনক ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে এইভাবেই ভারতে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আন্তঃএশীয় বাণিজ্যের স্বার্থেই মসুরিপতম এবং সুরাটের মত প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ভারতের পক্ষে তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি। পর্তুগীজদের চেয়ে ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য অধিকতর সচেষ্ট ছিল। নৌ-অধ্যক্ষ কর্ণেলিস ম্যাটেলিয়েকের ১৬০৫ সালের এক নথিতে জানা যায় যে, ওলন্দাজদের চেষ্টা ছিল লবঙ্গ, ছোট এলাচ ও বড় এলাচ ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার অর্জন এবং বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য করমণ্ডলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। কিছুদিনের মধ্যেই গুজরাটের প্রতিও তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ১৬০৫ সালে ওলন্দাজ কুঠিয়াল ভ্যান সোল্ডট মসুলিপতম বন্দরে আসেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি গোলকুণ্ডার রাজার কাছে মসুলিপতমে কুঠি স্থাপন এবং স্বল্প হারে শুল্ক প্রদানের জন্য একটি ফরমান লাভে সফল হন। এইভাবে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর ব-দ্বীপে ওলন্দাজদের প্রথম কুঠিগুলি স্থাপিত হয়। এই অঞ্চল ছিল বান্টাম, অচিন, মালাক্কা এমনকি সুদূর ম্যানিলায় রপ্তানিকৃত বিপুল পরিমাণ হাল্কা বেশমবস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনের জন্য প্রসিদ্ধ। কর্ণাটকের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত বৃদ্ধি পাবার পর ওলন্দাজরা বুঝলেন যে, আরো দক্ষিণে আরো বস্ত্র বয়ন হয় এবং গোলকুণ্ডার শাসকের এলসাকায় যে দামে বস্ত্র ক্রয় করা হয় তার চাইতে বিজয়নগরের দয়ালু শাসকের অধীনস্থ এলাকায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সূক্ষ্মতর রেশমবস্ত্র ক্রয় করা সম্ভব। পুলিকটে তৈরি বস্ত্রের মশলাদ্বীপে বিশেষ চাহিদা ছিল। এইসব চিন্তা করেই ওলন্দাজ কুঠিয়ালরা প্রথমে জিঞ্জির নায়কের এলাকা তেনোগাপতমে বাণিজ্যিক সুবিধালাভের চেষ্টা করেছিলেন। এরপরে তাঁরা পুলিকটের প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং কালক্রমে পুলিকটই হয়ে ওঠে ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ১৬৯০ সালে নেগাপতমকে ওলন্দাজদের প্রধান কার্যালয় রূপে ঘোষণা না করা পর্যন্ত পুলিকটই ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র থাকে।

উত্তরে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে ওলন্দাজদের অনেক বেশি সময় লেগেছিল। শুধু যে ওলন্দাজদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে গুজরাটী বস্ত্রের গুরুত্ব কম ছিল তাই নয়, মুঘল দরবারে পর্তুগীজ প্রভাব এড়িয়ে অন্য কোন ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থার পক্ষে নিয়মিত এবং বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করা দুরূহও ছিল। ১৬০৭ সালে সুরাটে ভ্যান দেনসেন মৃত্যুমুখে পতিত হবার পরে

ওলন্দাজদের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিতির প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এরপর ১৬১৭ পর্যন্ত গুজরাটে কোন স্থায়ী ওলন্দাড কুঠি খোলা সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রধান পর্তুগীজ ঘাঁটিগুলি ধ্বং করে বাণিজ্যের পথ নিষ্কন্টক করতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু অক্লান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ওলন্দাজরা এ সঙ্কল্প রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়।

ওলন্দাজরা প্রথমে পর্তুগীজ জাহাজগুলিকে একে একে আক্রমণ করতে শুরু করে। পরে স্থলপথেও তাদের আক্রমণ করা হয়। কুঠি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ওলন্দাজ কোম্পানী জলপথে গোয়া ও মালক্কা অবরোধ করতে সক্ষম হয়। মশলা দ্বীপে আম্বোয়না দখল হয় ১৬০৫-এ এবং পর্তুগীজরা ফিলিপাইনস্ থেকে স্পেনীয় সৈন্য নিয়ে এলেও বারবার ওলন্দাজদের কাছে পারজিত হবার ফলে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও ১৬৩৩ সালেও ওলন্দাজ কোম্পানীর এক কর্মচারী মনে করছিলেন যে, মালাক্কায় পর্তুগীজদের বস্ত্র বিক্রয়ের ফল ওলন্দাজ কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছিল। ইন্দোনেশীয় ভূখণ্ডে পর্তুগীজদের করমণ্ডল ও সুরাটের কাপড় তখনও প্রচুর পরিমাণ বিক্রয় ও ব্যবহার হ'ত। এই ব্যবসা বন্ধ করার উপায় ছিল গোয়া এবং মালাক্কা দখল এবং করমণ্ডল উপকূলে পাহারাদারি। ওলন্দাজদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সিংহলের এলাচ ব্যবসা অধিকার এবং মালাবারে পর্তুগীজ গোলমরিচের আড়ৎগুলি ধ্বংস করে দেওয়া। ১৬৩৬ থেকে পরপর দশবছর প্রত্যেক ব্যবসার মরসুমে গোয়া অবরোধ করা হয়। ১৬৪১ সালে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মালাক্কার পতন ঘটে। বিজয়নীতি চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে কলম্বো এবং কাচেিন বিজয়ের পর। ইংরেজ কুঠিয়ালদের লেখায় জানা যায় যে, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার মত মালাবার উপকূলেও পরাস্ত স্থানীয় শাসকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় যে ওলন্দাজদের প্রতিনিধি ব্যতীত দেশের কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হবে না।

৩৬.৪ ইউরোপীয় বণিক : ইংরেজ

প্রথমদিকে ওলন্দাজ কোম্পানীর তুলনায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল অনেক ছোট আয়তনের। সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে এর বাণিজ্যিক পরিকল্পনার সঙ্গে ওলন্দাজদের বাণিজ্য প্রণালীর কোন মিল ছিল না। ইংরেজদের প্রথম সমুদ্রযাত্রার লক্ষ্য যদিও ছিল ইন্দোনেশিয়ার গোলমরিচ বন্দরগুলি এবং মশলাদ্বীপপুঞ্জ কিন্তু অবিলম্বেই তারা দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, সামরিক ও নৌশক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী ওলন্দাজরা কোন প্রতিপক্ষকেই এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, শুধু ইংল্যান্ডের বাজারে এই পণ্য বিক্রয় করলে যথেষ্ট মুনাফা হবার সম্ভাবনা ছিল না। ওলন্দাজ এবং পর্তুগীজ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভারতীয় দ্বীপুঞ্জে যথেষ্ট বৃহৎ নৌবহর পাঠাবার প্রয়োজন ছিল। অথচ ইংল্যান্ডে যা গোলমরিচ প্রয়োজন ছিল তা এইসব জাহাজের যে কোন একটিতে করেই আনা যেত। এর ফলে ১৬০৩ সালে ইংল্যান্ডের বাজারে গোলমরিচের জোগান অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় কারণ ভারতে পাঠানো নৌবহর ফিরতি পথে জাহাজ ভরে শুধুই গোলমরিচ এনেছিল। ফিরতি নৌবহরে লাভজনক কোন দ্রব্য আহরণের উদ্দেশ্যেই ইংরেজ কোম্পানী ভারতীয় বন্দরিগুলির সঙ্গে

বাণিজ্যিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং গুজরাট করমণ্ডল ও পরিশেষে বাংলায় কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের পত্তন হয়।

সুরাট এবং লোহিত সাগরের বাণিজ্য সম্ভাবনা পর্যালোচনা করার প্রথম পরিকল্পনা হয় ১৬০৭ সালে লণ্ডনে ক্যাপ্টেন কিলিং ও উইলিয়াম হকিন্সের নেতৃত্বে। এর বছর দুই পরে হক্সি সুরাটে উপস্থিত হন এবং বেশ কিছুদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় কাটিয়েও যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমদিকে ইংরেজদের মুঘল বন্দরে বাণিজ্য করার চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। দশমবারের সমুদ্রযাত্রার পর ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বেন্ট মুঘলদের কাছে একটি রাজকীয় অনুমতিপত্র লাভ করেন। এর পর থেকে তাদের মুঘল রাজকর্মচারীদের হাতে লাঞ্ছনা থেকে অনন্ত রেহাই মেলে। তবে সমুদ্রপথে পর্তুগীজ হামলা চলতেই থাকে।

সুরাটে বাণিজ্য করতে গিয়ে ইংরেডজরা পর্তুগীজদের কাছে প্রবল বাধা পান। পর্তুগীজ নৌবহরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে প্রয়োজন ছিল আরো শক্তিশালী নৌবহর আর মুঘল রাজদরবারে জেসুইট পুরোহিতদের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজদের তরফে একজন দক্ষ কূটনৈতিক প্রতিনিধি। পর্তুগীজদের সুরাটে কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারার পরই ইংল্যান্ডে সরাসরি ভারতীয় পণ্যবাহী দু-একটি জাহাজ পাঠানো হয়। এছাড়া পূর্বভারতীয় বাজারে জাভার বান্টামে উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি করে শতকরা ৩০০ ভাগ লাভ করাও সম্ভব হয়েছিল। সুরাটে কুঠির উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যামেন্ডর সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য। এছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নেবার জন্যে ১৬১০ সালে করমণ্ডুল উপকূলে প্রতিষ্ঠিত হয় মসুলিপতম কুঠি। মাদ্রাজের অভ্যুত্থানের পরেও এই কুঠির গুরুত্ব কমেনি।

বছর দশেক ভারতে ব্যবসা করতে করতে ইংরেজ কোম্পানী ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের ধারা এবং এখানকার বাণিজ্যিক জগতে ভারতের গুরুত্বের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে তারা ক্রমশ তাদের বাণিজ্যের পরিধি বিস্তারে য-বান হয়। স্যার টমাস রো ১৬১৫ সালে মুঘল দরবারে রাজা প্রথম জেমস-এর দূত নিযুক্ত হন এবং ভারতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য অসংখ্যা ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। এছাড়া পারস্যের সঙ্গেও কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা হয়। লোহিত সাগর এবং পারস্যের খাঁড়িতে বাণিজ্য তখনও নানা রাজনৈতিক প্রাববে প্রভাবিত ছিল এবং ১৬২২ সালে যৌথ ইঙ্গ-পারসীয় ফৌজের দ্বারা একদা দুর্ভেদ্য ওরমুজ বহন্দর দখল না করা পর্যন্ত পর্তুগীজ আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দুর হয়নি। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুঘল ফৌজ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বহিশষ্কার করে। উপমহাদেশের খাদ্যভাণ্ডার বলে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র এই অঞ্চলে হৈ সময় থেকেই ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীগুলির বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ ঘটে।

সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে উত্তর ইউরোপীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলির ব্যবসায়িক সংগঠনে একটিই ধারা লক্ষ্য করা যেত। তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কোন একটি বৃহৎ ভারতীয় বন্দন সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘাঁটি স্থাপন এবং এই ঘাঁটির অধীনে দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উযপাদন

কেন্দ্রগুলিতে ছোট ছোট কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা। প্রধান ঘাঁটিগুলি একে অপরের অধীন ছিল না কিন্তু তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কার্যনির্বাহী সম্পর্ক রক্ষিত হ'ত। জাভাতে একটি মজবুত ঘাঁটি থাকায় ওলন্দাজরা ভারতীয় উপমহাদেশের কুঠিগুলি সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত থাকতে পেরেছিল ইংরেজরা তা পারেনি। স্থানীয় শাসকের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য তারা ১৫৩৯ সালে দখল করে মাদ্রাজ, ১৬৬৫ সালে বোম্বাই এবং ১৬৯৬-৯৭ সালে শুরু করে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ। ১৬৮৭-৮৯ সালে স্যার জোশিয়া চাইল্ডের শাসনাধীনে ইংরেজ কোম্পানী মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

৩৬.৫ ইউরোপীয় বণিক : ফরাসী

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতে ফরাসী বাণিজ্য এবং উল্লেখযোগ্য মান অর্জন করে। ১৬৬৪ সালে কোলবার্ট Compagnic des Indes Orientales (প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্য সংস্থা) গঠন করে প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সূচনা করেন। সুরাটে তাঁরা একটি কুঠি স্থাপন করেন এবং একজন ওলন্দাজ কুঠিয়ালকে (ফ্রাঁসোয়া কারোঁ) ভারতে ফরাসী বাণিজ্য সংগঠনের ভার দেন। এই সময়ে ভারতে ফরাসীদের প্রধান সমস্যা ছিল দেশীয় শাসকদের কাছে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় এবং ভারতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির প্রতিবন্ধকতা। ১৬৬৬ সালে মুঘল দরবারে কোলবার্ট প্রেরিত প্রতিনিধি ওলন্দাজদের সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করার অনুরোধ করেন। চার বছর পরে ভারতীয় উপকূলে নয়টি যুদ্ধজাহাজ বিশিষ্ট এক বিশাল ফরাসি নৌবহরের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ফরাসীদের নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধের ফলে এই নৌবহর বিশেষ কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৬৭২ সালে না হায়ে করমণ্ডুল উপকূলবর্তী সাঁও তোম দখল করেন। গোলকুণ্ডার রাজা এসময় পর্তুগীজদের কাছ থেকে সদ্য সাঁও তোম জয় করেছিলেন। ওলন্দাজ এবং গোলকুণ্ডারাজের মিলিত বাহিনী লা হায়ের কাছ থেকে সাঁও তোম উদ্ধার করে। লা হায়ের নৌবহরের সাফল্যের এখানেই ইতি। কিন্তু এই নৌবহরের এক প্রতিনিধি বেলার্জর দ্য লেস্পিনে নিকটবর্তী বিজাপুর রাজ্যে একটি ছোট গ্রাম লাভ করেন। এই পঁদিচেরি গ্রাম পরে ভারতে ফরাসী বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশিদিন ফরাসী কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করে। ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৬-এর মধ্যে এরা ভারতে ৩৫টি জাহাজ পাঠায়। ১৬৭৯ থেকে ১৬৯৫-তে পাঠায় ৩৯টি জাহাজ এবং ১৬৯৭ থেকে ১৭০৬-এর মধ্যে আরো ১০টি। ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের তুলনায় অবশ্য এ বাণিজ্য ছিল অনেক কম। ১৭১৯ সালে জাঁল-এর দ্বিতীয় ফরাসী কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর ভারতে কার্যকলাপ আরো বিস্তৃত হয়।

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি হয়ে থাকে বন্দুকধারী সৈন্যদের পাহারা দেওয়া সশস্ত্র দুর্গ, তাহলে নৌ অবরোধও ছিল এই বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। সুরাট বা হুগলীর মত যেসব গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে ইউরোপয়ীদের মুঘল রাজকর্মচারীদের অধীনে ব্যবসা করতে হ'ত এসব জায়গায় স্থলপথে কোন বাধা পেলে ইউরোপীয়গণ নৌ অবরোধের দ্বারা ভারতীয় জাহাজগুলিকে বন্দর ত্যাগে বাধা দিয়ে মুঘল শাসকগণের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতক। ভারতীয় শাসকগণ প্রায়ই কোন প্রকার অমনোনীত কিছু ঘটলে ইউরোপীয় কুঠিগুলির খাদ্য

এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ বন্ধ করে দিতেন। ইউরোপীয়গণ এর জবাবে তাঁদের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে নির্দেশ দিতেন বন্দুর অবরোধ করতে অথবা ভারতীয় বণিকদের জাহাজ আটকাতে। এর ফলে উভয় পক্ষকেই সমঝোতার রাস্তা নিতে হ'ত এবং বিরোধ কখনোই খুব বেশি হিংসাত্মক রূপ নিত না। এইসব বিরোধের কারণ বহু ক্ষেত্রেই ছিল অবৈধ এবং অন্যায়ভাবে শুল্ক আদায়ের চেষ্টা। ইউরোপীয়রা মনে করত যে, এরকম শুল্ক আদায় অনুচিত। মুঘল কর্মচারীদের অবশ্য বক্তব্য ছিল যে, ইউরোপীয় বণিকরা অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য প্রদেয় শুল্ক ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত অথবা ভারতীয় বণিকদের পণ্য ইউরোপীয় জাহাজে তুলে সরকারি কোষাগারকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করত। ১৭১৭ সালে ইংরেজ কোম্পানী এক মুঘল ফরমান লাভ করে যাতে বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকা করের বিনিময়ে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থাকে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে শুল্কছাড় দেওয়া হয়। ফারুকশিয়আরের এই ফরমানই ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কার্যপ্রণালীর প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। স্থানীয় শাসকের অধীনতা থেকে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থাকে প্রায় মুক্ত করে এই ফরমান পরবর্তীকালে নানা দুর্নীতি ও অন্যায়ের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে দেশীয় বণিকগণ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং অনেক সময় শুল্ক এড়াবার জন্য কোম্পানীর ছাড়পত্র নগদ মূল্যে কিনতে বাধ্য হয়।

১৭৪০-এর গোড়াতেই কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির দুর্বলতা, প্রাদেশিক স্বাধীনতা এবং মারাঠা সামরিক শক্তির অভ্যুত্থআন ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছিল। এই বোধ থেকেই করমণ্ডলে দুই যুযুধান প্রতিযোগী রাজবংশের সমর্থন করতে গিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ বাধে। পলাশীর বিপ্লবও অনেকটা একই ধরনের ঘটনা। এভাবেই বাংলায় ইংরেজ শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ অনেক সময়েই তাঁদের কর্মচারীদের কার্যকলাপ সুনজরে দেখতেন না। অকারণে কোন নতুন বাণিজ্যিক ঘাঁটির পত্তন যেমন ব্যয়বাহুল্যের কারণ বলে গণ্য হ'ত তেমনি উপমহাদেশে রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাও অপব্যয়ের সূচনা বলে বিবেচিত হ'ত। মনে করা হ'ত যে, এতে বাণিজ্যিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে অথচ কোন অতিরিক্ত আর্থিক লাভ হবে না। ১৭৫৮ সালে পলাশীর যুদ্ধে অল্প কিছুদিন পরে যখন কলকাতা কাউন্সিল নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদকে সন্ত্রস্ত রাখার উদ্দেশ্যে কাশিমবাজার কুঠিকে শক্তিশালী করে তুলতে চায় তখনও কোম্পানী তাদের লাভক্ষতির অঙ্কের হিসেব কষছিল। বাংলায় তাদের কর্মচারীদের তারা সতর্ক করে দেয় যে, সামরিক পরিকল্পনার আবেগে কর্মচারীরা যেন ভুলে না বসে যে তারা প্রকৃতপক্ষে শুধু একদন বণিক যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবসা।

৩৬.৬ ইউরোপীয় বণিককুল ও ভারতীয় অর্থনীতি

আমেরিকায় রৌপ্যখনি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় বণিককুলের যে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সূচনা হয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। এর ফলে পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়ার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য ঘাটতির অনেকটা পূরণ করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে সোনা-

রূপা আমদানির কি প্রভাব পড়েছিল তা অনিশ্চিত। সোনা-রূপা অনেক সময়েই অলঙ্কারে রূপান্তরিত হ'ত। কিন্তু ধাতু আমদানি হ'ত, ভারতীয় মূল্যমানে তার কি প্রভাব পড়েছিল এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক লেনদেন এবং মুদ্রা ব্যবস্থায় সোনা-রূপার কি ভূমিকা ছিল এ সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা যায় না। সবসময় সোনার দাম এরকম যেত না। ব্যবসার অবস্থা অনুযায়ী ওঠানামা করত। সোনা-রূপা অনেক সময় ভারতে বাইরেও চলে যেত—যেমন ইউরোপ বা ফিলিপাইনস্ থেকে আমদানি রূপা চলে যেত চীনে। ইতালীয় পর্যটক গ্যামেলি কারোরি যে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সারা পৃথিবীর সোনা-রূপার স্থান ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে', কথাট্য অতিরঞ্জন। একমাত্র আমেরিকার রূপারই চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল ভারতে। কোন পথে এই রূপা আসত সে সম্বন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পদাধিকারী তাঁর বিবরণ দিগয়ে গেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে স্পেনের পথে এই রূপা ছড়িয়ে পড়ত সমগ্র এশিয়ায়। এর একটা ধারা আসত রেশমের জন্য আলেপ্পো থেকে। আরেকটি ধারা এসে পৌঁচত লোহিত সাহরের মোখা বন্দর থেকে সূতীবস্ত্রের জন্যে। অপর একটি প্রবাহ পৌছত উত্তমাশা অন্তপীপ পেরিয়ে সুরাট এবং পূর্বভাতীয় দ্বীপুঞ্জে নীল, গোলমরিচত, লবঙ্গা, দারুচিনি এবং এলাচের জন্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই পাদধিকারীর মতে, এশিয়ার আগত সম্পূর্ণ সোনা-রূপার মূল্য চিল ১.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড।

পতুর্গগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ সকলেই ভারতে সোনা-রূপা আমদানি করতেন। Mercantilist-রা এভাবে ক্রমাগত সোনা-রূপার আমদানি ভাল নজরে দেজখতেন না। তাঁর মনে করতেন এতে সোনা-রূপা রপ্তানিকারী দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে একই মুদ্র ব্যবহৃত হবার ফলে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষতির অপেক্ষা ছিল। সোনা-রূপার দাম ওঠানামার ফলে এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ভাবা হ'ত। আর্থিক মন্দার সঙ্গো মুদ্রা ঘাটতির প্রত্যক্ষে সম্বন্ধ ছিল।

তাই ইউরোপীয় বণিকরা আগ্রহী ছিলেন প্রধানত এক স্থানের পণ্য অপর স্থানে বিক্রয় বা পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যে (reexport trade)। ওলন্দাজরা অনেক সময়ে ভারতীয় বাজারে উৎকৃষ্ট মশলা আমদানির বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারতেন। ইংরেজরা আনতে পারতেন শুধু একধরনের মসৃণ কালো কাপড় এবং সিসা, টিন এবং লোহার পাত এবং নানাবিধ পাশ্চাত্যদেশীয় বিলাসদ্রব্য।

ইউরোপ থেকে ফিরতিপথে জাহাজে কি নিয়ে আসা হবে এটা ছিল এক সমস্যা। ইউরোপীয় পণ্য রপ্তানি করার সুযোগ ছিল সীমিত। বরং এশিয়া থেকে কেনা জিনিস ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রি করে কিছু লাভ হ'ত। ইউরোপ, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রীতদাস কর্ষিত আবাদের মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্বন্ধ ছিল তা ছিল পূর্বভারতীয় বাণিজ্যের বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকা।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা একমাত্র গোলমরিচের ব্যবসাতেই লিপ্ত ছিল। গোলমরিচ সংগ্রহের জন্য কোচিন, কান্নানোর, কুইলনে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। মনে করা হয় যে, ১৬১৫ সালে মালাবারে উৎপন্ন গোলমরিচের শতকরা ৩০ ভাগ পর্তুগীজরা পাঠয়ে দিত লিসবনে। Antwerp-এর বণিকগণ ইউরোপে পর্তুগীজ গোলমরিচ বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতেন। গোলমরিচের এই ঢালাও চাহিদার

কারণ গোলমরিচ কেনার জন্য কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা সংগঠন প্রয়োজন ছিল না। ইউরোপে এর অফুরন্ত চাহিদা ছিল এবং বিক্রির সুবিধাও ছিল। অন্যান্য দামী জিনিসের সঙ্গে গোলমরিচ দিয়ে জাহাজগুলিতে ভারসাম্য বজায় রাখাও সহজ ছিল।

কালক্রমে বস্ত্র ব্যবসার গুরুত্বের ফলেই মরিচ ব্যবসার গুরুত্ব হ্রাস পায়। করমণ্ডল ও গুজরাট থেকে বস্ত্র আমদানি শুরু হয় ইন্দোনেশিয়ায়। ক্রমে ইউরোপেও বস্ত্র রপ্তানি শুরু হয়। ১৬১৩ থেকে ক্যারিকোর নিয়মিত নিলাম শুরু হয়। ইউরোপে যে সব কাপড় পাওয়া যেত তার চেয়ে ভারতীয় সূতীবস্ত্র অনেক সুলভ হওয়ায় এই চাহিদার সৃষ্টি হয়। সপ্তদশ শতকের শেষে ভারতীয় বস্ত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৬৬৪ সালে ইংরেজ কোম্পানীর সামগ্রিক কেনাবেচার ৭৩% দখল করেছিল বস্ত্র ব্যবসায়। পরবর্তী দুই দশকে এর পরিমাণ ৮৩%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৬৮০-র দশকে ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রা অর্জন করে।

ইংরেজ ও ওলন্দাজ নথি থেকে জানা যায় যে, মোট পাঁচরকম বস্ত্র আমদানি হ'ত—

(১) সাধারণ সাদা বস্ত্র, (২) সাধারণ রঙিন বস্ত্র, (৩) ডোরাকাটা ও চৌকো চৌকো দাগ কাটা কাপড়, (৪) জরি বসানো ও নকশা করা কাপড় এবং ৯৫) রেশমের কাপড়। রঙের বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভারতীয় জরির বিশেষ কদর ছিল। ভারতীয় রেশম বস্ত্রের মধ্যে বাংলার রেশমবস্ত্রই ছিল উল্লেখযোগ্য। সূতীবস্ত্রের মধ্যেও কয়েকটি ভাগ করা যেত—যেমন সাধারণ কাপড় ও মসলিন বা অতি মিহি বস্ত্র। পশ্চিম ভারতে পাওয়া সস্তা কাপড় দিয়ে আফ্রিকার সঙ্গে দাস ব্যবসা করা যেত আর মাদ্রাজ ও বাংলায় তৈরি হ'ত মধ্যমরকম বস্ত্র। সুরাট থেকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের গতি যেভাবে করমণ্ডল এবং সর্বশেষে বাংলার দিকে ঘুরেছিল তাতে মনে হয় যে আগে ইউরোপে ছিল সস্তা কাপড়ের চাহিদা। পরে তা পরিবর্তিত হয় অভিজাত মহলের শৌখীন বস্ত্রের চাহিদায়।

এছাড়া চাহিদা ছিল নীলের। এর পরে ছিল সোরা ও বাংলার রেশম বস্তর। রং করার কাজে ইংল্যাণ্ডে নীল ব্যবহার হ'ত। এর রং ছিল পাকা এবং সস্তা। আমেদাবাদ ও আগ্রায় ভাল নীল পাওয়া যেত। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্পেন অধিকৃত আমেরিকায়ও নীল তৈরি হ'তে থাকে এবং ভারতীয় নীলের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নীল উৎপাদন ব্যাহত হ'লে তবেই ভারতীয় নীলের বাজার আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারত থেকে সোরা আমদানি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোরল্যাণ্ডের মতে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের আগে পর্তুগীজ জাহাজে সোরা বহন করে নিয়ে যাবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্থলপথে সোরা বহন করে নিয়ে যাওয়া ছিল খুবই ব্যয়বহুল। জলপথের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এই সময়ে ইউরোপে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হ'তে থাকে এবং গোলাবুরাদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ফারত থেকে আমদানি সোরার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

সোরার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল বাংলার রেশম। কাশিমবাজারের আশপাশ এবং উত্তরবঙ্গের তুঁত বাগিচায় উৎপন্ন রেশমের উৎকর্ষ ছিল ভারতবিখ্যাত এবং এই অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় একটি বৃহৎ রেশম বয়ন শিল্প গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় বয়ন শিল্পে রেশমের সুতোর চিরাচরিত

চাহিদা মেটাত ফ্রান্স, ইতালী ও পারস্যদেশ। ১৬৫০ থেকে বাংলার রেশম এই স্থান অধিকার করে এবং সূতীবস্ত্রের পরই সবচেয়ে মূল্যবান আমদানীকৃত পণ্য হয়ে ওঠে রেশম।

৩৬.৭ ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি ও তার প্রতিক্রিয়া

ওলন্দাজ ও ইংরেজরা ব্যবসা শুরু করার আগে পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সামান্যই। পর্তুগীজদের বাণিজ্যের পরিমাণ একেবারে অবহেলার যোগ্য না হলেও নিশ্চয়ই পরবর্তী যুগের তুলনায় কম এবং বৈচিত্র্যহীন ছিল। উত্তর ইউরোপে যৌথ মালিকানার বাণিজ্য সংস্থা সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক সুযোগ ঘটে। এই সংগঠন পরিচালিত হ'ত কতকগুলি নিয়ম (Operational rule) অনুসারে। জাহাজ যাতায়াতের জটিল দিনপঞ্জীর সমন্বয় সাধন, ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের মান নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ বাজারের গতির পরিমাপ, পপণ্য ক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া এবং সেই পণ্য সংগ্রহ করা এবং তার চেয়েও বেশি করে দেশীয় শাসককুলের সঙ্গে সুপরিকল্পিতরূপে রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা—প্রতিটি কাজের জন্যই এই ধরনের নিয়নের উদ্ভাবন হয়েছিল। ইউরোপে নিদে৪শ জারি এবং ভারতে সেই নির্দেশ কার্যকরী করার মধ্যে যে জদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকত তার ফলে সিদকদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না ঘটে তার জন্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ত্রুটিহীন করার চেষ্টা ছিল।

যৌথ মূলধনের পূর্বভারতীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি কয়েকটি দিক থেকে আধুনিক, বহুজাতিক, বহুমুখী বাণিজ্য সংস্থাগুলির পূর্বসূরী ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এদের বাণিজ্য ছিল পৃথিবীবিস্তৃত এবং কেন্দ্রীভূত বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে পাইকারি বিপণন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। এর অর্থ ছিল বিভিন্ন কারিগরের ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যগুলি যাতে একটি নির্দিষ্ট গুণগতমান অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেগুলিকে আমদানির উপযোগী করে তোলা। ভারতীয় বাণিজ্য জগতে এইভাবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং এই পণ্যের যোগানদারদের কাছ থেকে পণ্যগুলি নিয়মিত সংগ্রহ করা এবং তা করতে গিয়ে সম্ভাব্য ক্ষতির মোকাবিলা করা ছিল এক অভিনব ব্যাপার। অবশ্য লোহিত সাগর, পারস্য সাগর এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত ভারতীয় বণিকগণও যথেষ্ট বিবেচনা করেই তাঁদের পণ্য সংগ্রহ করতেন কারণ বিশেষ বিশে, বাজারে বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্ত্রের চাহিদা ছিল। এই সকল স্থানে বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ মরসুম ছিল এবং বণিকদের সেই অনুসারে তাঁদের পণ্য সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করতে হ'ত। কিন্তু ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের কার্যধারার প্রধান পার্থক্য ছিল তাদের পণ্য সংগ্রহের বিপুল লক্ষ্যমাত্রায় এবং তাদের চুক্তি কার্যকরী করার নির্দিষ্ট আইনানুগ পদ্ধতিতে। দজাহাজ ছাড়ার মরসুমে ইউরোপীয় সংস্থাগুলির সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ডের সংখ্যা প্রায়ই এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যেত। এগুলি লণ্ডন এবং আমস্টারডামে গাঁটরি হিসেবে বিক্রি হ'ত। সম্ভাব্য ক্রোতাদের শুধু নমুনা দেখানো হ'ত। বস্ত্রের গুণগত মান রক্ষার জন্যে ইউরোপীয় কারখানাগুলি উদ্ভাবন করেছিল তালিকা (muster) পদ্ধতির। ইউরোপ থেকে জাহাজ এসে পৌঁছনোর সম্ভাব্য সময়ের আট-দশ মাস আগেই ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করা হ'ত। চুক্তিতে পণ্যের সঠিক গুণগত মান, পরিধি এবং

বস্ত্রের মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে কবে সেগুলি পাওয়া যাবে এবং কোন বিশেষ বণিকের মাধ্যমে এই সকল বিষয় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকত। গুদামে বস্ত্র নিয়ে আসার পরে নমুনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ বস্ত্রগুলি বাছাই করতেন। 'তালিকা'র সঙ্গে কোনরকম গরমিল দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রগুলি বাতিল হয়ে যেত অথবা তাদের চুক্তি অনুসারে প্রদেয় মূল্য হ্রাস করা হ'ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থা অনেক সময়ে যতক্ষণ না সমস্ত বস্ত্র ক্রয় সম্পন্ন হ'ত ততক্ষণ পর্যন্ত বাতিল বস্ত্র আটকে রাখতেন যাতে না জাহাজ ছাড়ার সময় নিকটবর্তী হলে ওই বাতিল বস্ত্র কোনভাবে কেউ পুনরায় বিক্রয় করার চেষ্টা করতে পারে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা অনেক সময় অভিযোগ করতেন যে, নমুনার সঙ্গে হুবহু মেলাতে গেলে অনেক সময় তাঁদের বিপুল ক্ষতি হ'ত কারণ বস্ত্রগুলি অল্প সংখ্যায় একেকজন তাঁতীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হ'ত এবং দেখা যেত যে একই তাঁতীও ঠিক একইরকম দুটি বস্ত্র বয়ন করতে পারতেন না। স্থানীয় বাজারে যেহেতু ইউরোপে পাঠাবার উপযোগহী কাপড়ে কোন চাহিদা ছিল না সেহেতু ব্যবসায়ীগণ অনেক সময়ে বিপুল পরিমাণ বিক্রয়ের অযোহগ্য কাপড় নিয়ে অসুবিধায় পড়তেন। তবে এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যে একেবারেই কোন দরাদরি করার অবকাশ ছিল না এমন নয়। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি যেমন তাদের উন্নত আর্থিক সম্পদের জোরে যৌথভাবে বাজার দখল করে থাকতে পারত এবং উৎপাদনের এমন নির্দিষ্ট মান দাবি করত যা ছোট ছোট একক কারিগরি প্রচেষ্টায় একান্ত দুর্লভ তেমনি দেশীয় ব্যবসায়ীগণও অনেক সময় একেবারে জাহাজ ছাড়ার সময় পর্যন্ত পণ্য সরবপাহ করতে দেরি করতেন। এর ফলে ইউরোপীয় পণ্য সংস্থাগুলিকে হয় যেমন বস্ত্র পাওয়া যেত সেইগুলিই ক্রয় করতে হ'ত অথবা জাহাজগুলিকে শূন্যভাবেই ফেরত পাঠাতে হ'ত, যার ফলে সামগ্রিক ব্যয় অনেক বেড়ে যেত।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সব ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থা ভারতের সঙ্গে বস্ত্র ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন যে শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে বাজারের একটা বিশেষ যোগসূত্র আছে। চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ভারতীয় তাঁতীরা দু'ধরনের সমাধান উদ্ভাবন করেছিলেন। একদল তাঁতী খোলা বাজারের জন্য সুপরিচিত পুরনো রীতির বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাঁতীরা বিশেষ কিছু ব্যবসায়ীর কাছে অগ্রিম মূলধনের বিনিময়ে এক বিশেষ ধররেন কাপড় যোগান দেবার চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। এই দু'ধরনের প্রথার পার্থক্যের অর্থ এই নয় যে এক ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকলে অন্য ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করা চলত না। ব্যস্ত রপ্তানির মাসে যে তাঁতী ফরমাশমাফিক কাপড়ের যোগান দিত সেই একই তাঁতী হয়তো শ্লথ মাসগুলিতে নিজ দায়িত্বে কাপড় বুনত। কিন্তু সে যাই বুনুক, তাঁতীর সঙ্গে কোন পর্যায়েই প্রকৃত ক্রেতার যোগাযোগ ঘটত না। মাঝখানে সবসময়ইে থাকত কয়েকজন মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। মূলধনের উৎস নিজস্ব বা দাদন যাই হোক না কেন, তাঁতী সর্বদাই তার বস্ত্র বাজারে পাঠাবার জন্য পাইকারি বিক্রেতার উপর নির্ভরশীর থাকত। ইউরোপের putting out প্রথা বা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে ফরমাশ মাফিক উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার সঙ্গে এই বাণিজ্যিক অগ্রিম অর্থ প্রদানের অনেক সময় তুলনা করা হ'লেও, ভারতীয় তাঁতী সর্বদাই চিরাচরিত ধারায় চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম অর্থই পেত, কাঁচামাল

নয়। এই অগ্রিম অর্থ প্রদানের দুটি তাৎপর্য ছিল। এক হচ্ছে তাঁতীকে কাঁচামাল কিনতে সাহায্য করা এবং উৎপাদন চলাকালীন সময়ে তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহের সংস্থান করা। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল অগ্রিম টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণে কাপড় বোনানো। এই চুক্তিতে দু'পক্ষেরই দায়িত্ব থাকত। বণিক যেমন সময়মত নির্দিষ্ট মানের কাপড় পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারত তেমনি তাঁতীও তার উৎপাদনের মূল্য পাওয়া সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি এইভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করে চুক্তি পাকা করার প্রয়োজন ভালোভাবেই বুঝত। কিন্তু তারা কদাচিৎ তাঁতীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করত। সর্বদাই যোগাযোগের মাধ্যমে ছিলেন ভারতীয় দালালরা, যাঁরা লাভের কিছুটা অংশ নিজেদের হাতে রাখতেন, অথখবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীগণ যাঁরা সর্বদা জোট বেঁধে কাজ করতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথম আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব পরিপূর্ণরূপে অনুভূত হয়। ১৬২৪ সালে একজন ইতালীয় অভিজাতবংশীয় পর্যটক যখন শোনেন যে, সুরাটে মুঘল কর আদায়ের প্রতিবাদে ইংরেজরা কিছু ভারতীয় জাহাজ দখল করে নিয়েছে তখন তিনি মন্তব্য করেন যে, এই পদক্ষেপ চরম ভ্রান্ত কারণ মুঘল সম্রাটের সমৃদ্ধির প্রধান উৎস তাঁর ভূ-সম্পদ। তাঁর সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের পরিমাণ এতই যৎসামান্য যে এই সম্পদ তাঁর যে কোন সাধারণ কর্মচারী যথা, সুরাটের শাসকের উপযুক্ত। বোম্বাই-এর শাসক স্যার জন চাইল্ডও মুঘলদের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পররে বুঝতে পারেন যে, ইংরেজদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মুঘলদের উপর বিশেষ কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না কারণ মুঘলরা ব্যবসাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না এবং মুঘল সাম্রাজেড্যর পশ্চিম অংশের মানুষও এত দরিদ্র নয় যে তারা ব্যবসা না করলে অভুক্ত থাকবে। ইউরোপীয় ব্যবসা সম্বন্ধে এইরকম অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য পাওয়া যায় ১৬৯৪ সালের আরেকজন বোম্বাই পর্যটনকারী মুসলমানের লেখায়, যিনি লিখেছিলেন যে, বোম্বাই দ্বীপের রাজস্ব পাঁচ লক্ষের বেশি নয় এবং এইসব কাফেরদরে বাণিজ্যের লাভও কখনোই কুড়ি লাখের বেশি নয়। ইংরেজ উপনিবেশ চালানোর বাকি খরচ আসে অন্যান্য জাহাজ লুঠতরাজ করে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সরকারি এবং বেসরকারি ইউরোপীয় বাণিজ্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, বণিক এবং তাঁতীর কাছ থেকে ভারতীয় শাসক প্রচুর কর আদায় করতে সক্ষম হন। এই বৃদ্ধি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে বাংলায়। ১৭৮০ সালে মারাঠা আক্রমণের আগে বাংলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশারী প্রদেশগুলির অন্যতম। এখান থেকে প্রতিবছর ইংরেডজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী বণিকরা যে বিপুল কেনাকাটা করতেন তার ফলে এই প্রদেশের বয়ন শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় এবং বহু মানুষের এই শিল্পে কর্মসংস্থান হয়। ইউরোপীয় বাণিদজ্য সংস্থাগুলি কর্তৃক সোনা-পূপা আমদানির ফলে বাংলার অর্থনীতি যে বিশেষ লাভবান হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩৬.৮ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পর্তুগীজগণ কিরূপে ভারতের মশলা ব্যবসা দখল করেন লিখুন।

২। ওলন্দাজগণ কিভাবে ভারতের সূতীবস্ত্র ব্যবসায় বিস্তারে সাহায্য করে তার বিশদ বিবরণ দিন।

৩। ওলন্দাজরা কিভাবে ভারতে পর্তুগীজ ব্যবসা বিনষ্ট করে তার বিবরণ দিন।

৪। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের ধারা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৫। ভারতে বাণিজ্যের জন্য বিদেশী বণিকদের নৌবহর, দুর্গ এবং ঘাঁটির কি প্রয়োজন ছিল।

৬। ইউরোপীয় বাণিজ্যে কি কি পণ্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানি হ'ত ?

৭। ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি কিরূপ ছিল ?

৮। ইউরোপীয়গণ-কর্তৃক ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনে অর্থ লগ্নীকরণ এবং বস্ত্র বিপণন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। পর্তুগীজরা ভারতে এসেছিলেন কেন ?

২। ওলন্দাজরা ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হয় কেন ?

৩। ইউরোপীয় বণিকগণ নৌ অবরোধের আশ্রয় নিতেন কেন ?

৪। আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যের উপর আমেরিকায় রৌপ্যখনি আবিষ্কারের কি প্রভাব পড়েছিল ?

৫। সোনা-রূপা আমদানি সম্বন্ধে মার্কেন্টিলীয় মত কি ছিল ?

৬। ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্য পরিচালনার রীতিনীতি আলোচনা করুন।

৩৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. *Cambridge Economic History of India,* Vo. I.
2. Chadhuri K. N. : *Trade and Civilisation in the Indian Ocean : An Economic History from the Rise of Islam of 1750* (Cambridge University Press, 1985).
3. Bhattacharya S. K. : *The East India Company and the Economy of Bengal 1704-1740* (London, 1954).
4. Steensgaard Neils : *The Asian Trade Resolution of the Seventeenth Century (1974).*